রবীন্দ্রউপন্যাস ঃ রঙের সংকেত

সুশোভন অধিকারী

রঙ রেখা আকার--- এগুলি সাধারণভাবে একজন চিত্রকরের উপকরণ। তেমনই একজন সাহিত্যিক তাঁর ভাবনা বুনে চলেন শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে। প্রকাশেব ভঙ্গিতে আঙ্গিকের ভিন্নতায় স্বতন্ত্র মাত্রা দুটি পৃথক শিল্পমাধ্যম, বলাযেতে পারে দুটি সমান্তরাল শিল্পমাধ্যম। চিত্রকর হয়তো তাঁর ক্যানভাসে উজ্জ্বল সোনালি হলুদের প্রেক্ষাপটে গাঢ়বাদামি মেয়ের প্রতিমা গড়ে ফুটিয়ে তুলবেন এক ধরনের বৈপরীত্য, প্রকাশ করলেন এক বিশেষ অভিব্যক্তির। গোল্ডেন - ইয়োলোর সঙ্গে ঘন -- বাদামির পরস্পর বিন্যাসে এক দৃশ্যময় অভিঘাত রচিত হল -- যা নাড়া দেবে দর্শকের চোখকে। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কোনো কালো - মেয়ের ছবি স্মরণ করা যায়। এইভাবে হাল্কা ওগাঢ় রঙের কনট্রাস্টে তৈরি হয় দৃষ্টির নাটকীয়তা। এই দৃশ্যতাই ছবির প্রধান গুণ, অন্যতম অবলম্বন --চিত্রকলায় ঐটেই এক নম্বর প্রায়োরিটি, তারপর আসে ভাবের প্রসঙ্গে। চিত্রে এই দৃষ্টির নাটকীয়তা রচনা করতে রঙ ও ফর্ম থাকে প্রথম সারিতে। যেমন সাদার পাশে কালো, কমলার মধ্যে সবুজ বা নীলের গায়ে বসানো হলুদের তারতম্যে ওঠানামা করতে পারে এই নাটকীয়তার মাত্রা। প্রাথমিক বা পরিপূরক রঙে বা মিশ্র বর্ণেও এ ধরনের দৃশ্যজাত উদ্দীপন ঘনিয়ে তোলেন শিল্পী। এভাবে ভিসুয়াল সেনসেবিলিটির মধ্যে তিনি তাঁর ভাবনাকে অভিনব কৌশলে চিত্রপটে মেলে ধরেন। আর চিত্রকরের প্রয়োগ নৈপুণ্যে আন্দোলিত হয় দর্শক।

অন্যদিকে এক জন গল্পকার, এক জন ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের টানাপড়েনে গড়ে তোলেন আর রকমের নাটক। তিনিও উপন্যাসের কাঠামোকে স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় সাজিয়ে নেন, কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেন সাহিত্যেরএক নিজস্ব নাটকীয়তায়। স্থান কাল পাত্র সমন্বয়ে নির্মিত ছোট ছোট এপিসোডে তৈরি হয় বিভিন্ন মূহূর্ত এগিয়ে চলে গল্পের গতি তার মূল ভাবনাকে ভর করে। সেদিক থেকে মনে হয়, সাহিত্য ও চিত্রকলায় য়েন দুটি বিপরীতমুখী গতির প্রবাহ আছে। প্রদর্শশালায় ঢুকে দূর থেকে ছবির দিকে তাকালে প্রথমেই রঙ রেখা আকারে ছবির মূলকাঠামো নজরে আসে, তারপরে চোখ যায় ডিটেলের দিকে। কিন্তু কাহিনীর নির্যাস । গল্পের প্রবাহের সঙ্গে বাঁক নিয়ে নিয়ে যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন পাঠক, গল্পের শেষে সাঙ্গ হয় এক নিবিড় পথ -পরিক্রমা। অবশ্য স্ট্রোল জাতীয় ন্যারেটিভ স্টাইলের ছবিতেও এক রকমের ভ্রমণ সারা হয় দর্শকের--- তবে সে ধরনের চিত্রমালার অধিকাংশই ইলাস্ট্রেটিভ ছবির আওতায় পড়ে।

তবে কি ছবি ও সাহিত্যের এলাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন, দুজনের অবস্থানের মধ্যে বহু যোজন দূরত্ব?একের ছায়া অন্যের গায়ে একেবারেই পড়ে না ?না, তা মনে হয় না আমাদের। নিরন্তর সাহিত্য থেকে চিত্রকরদের মাথায় নানান আইডিয়া ঘুরপাক খেয়ে যায়, আবার ঘটে এর উল্টোটাও । কোথাও কাহিনীর অনুপুঙ্খ বর্ণনার ভিতর দিয়ে সহজেই তৈরি হয় ফ্রেমে বাঁধানো কত না চিত্ররাজি। কখনও সাহিত্য চিত্রকলা এমনকি চলচিচত্রও মিলেমিশে একাকার হয়েযায়--- এমন অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। চলচিত্রকার বা ঔপন্যাসিককেও দেখা যায়, বিশেষ বক্তব্যপেশকরতে গিয়ে কোনো রঙ বা আবহের প্রতি একটা বিশেষ ঝোঁক দিতে। হয়তো বা কাহিনীর নাটকীয় সংঘাতের মুহূর্তে, ক্লাইম্যাক্সের তীব্রতায় আশেপ

াশে ছড়িয়ে দেন তাৎপর্যময় কিছু রঙ, গেঁথে দেন বিশেষ উপমা ---ঘটনার রসকে ঘনতর করতে। কোনো রঙ বুঝি প্রতীকে রূপান্তরিত হয় কথাকারের কলমে, কখনও নায়ক নায়িকার মুডেরসঙ্গে তাল মিলিয়ে সেজে ওঠে পরিবেশ, বদলে যায় আবহাওয়া। লেখকের স্টাইলের সঙ্গে মিশে থাকে তাঁরবর্ণ প্রীতি, নিসর্গের প্রতি মগ্নতা, অভিজ্ঞতার সুদুর চৌহদ্দি। যেখানে পরতে পরতে জড়িয়ে যায় কথাকারের কত ব্যক্তিগত উচচারণ, ভুলতে না - পারা গোপন যন্ত্রণার ক্ষত --- যা ফিরে আসে মোটিফের মতো।

এমনটা ঘটে কোনো কোনো চিত্রকরের ছবিতেও। বিশেষত সিম্বলিস্ট ছবিতে রঙের ভূমিকা কেবল দৃষ্টিনন্দনের নয়, রঙ ও আকার সেখানে আলাদা অর্থ বহন করে। তবেই ছবিতে যদি সাহিত্যের অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে, পিক্‌টোলিয়াল কোয়ালিটি হারিয়ে যায়, তাহলে সে ছবি সাহিত্যেরই একটা এক্সটেনশন হয়ে দাঁড়ায়, সে আর ছবি থাকেনা। এখন দেখতে হরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে রঙ কোনো বিশেষ ভুমিকা পালন করে কিনা! বা গল্পের চরিত্রচিত্রণে কি চোখে পড়ে, প্রেক্ষাপটের তেমন তাৎপর্যময় প্রয়োগ ?অথবা কোনো স্বতন্ত্র মোটিফ কি লেখকের ব্যক্তিগত চিহ্নে পরিণত হয়---বিষয়গুলি ভেবে দেখবার। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তাঁর চিত্র - অভিজ্ঞতার দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিতে হয়ে। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে রঙতুলির প্রত্যক্ষ চর্চা তেমনভাবে না করলেও ছবির পরিমন্ডলে অবগাহিত হয়েছেন আজীবন। প্রিয় জ্যোতিদাদা বা অবন - গান ছবি এঁকেছেন তাঁর চোখের সামনেই। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবিকাই অবন - গগনের প্রাণনা ও পরামর্শদাতা। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তিকালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর নন্দলালকে কলাভবনে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের নন্দলালকে নতুন ভাবে গড়ে তুলেছেন তিনি। আর জীবনের শেষপর্বে চিত্রকর হিসাবে আর্বিভূত হয়ে হতবাক করেছেন আমাদের।

এই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের ছবি - আঁকার স্টুডিওতে ঢুকে তাঁর রঙের প্যালেটের দিকে তাকালে দেখা যাবে এই প্যালেট যেন কিছুটা সীমাবদ্ধ, সেখানে কয়েকটি নির্দিষ্ট রঙের ঘোরাফেরা। শিল্পীর পছন্দের অঙ্গুলি কয়েকটি বিশেষরঙের দিকে --- সোনালি হলুদ বা কমলা, লাল মেন বা পোড়ালাল, মভ গাঢ় বাদামি বা সাদা - কালো। এরাই তালিকার শীর্ষস্থান দখল করেছে। ছবিতে নীল বা সবুজের ব্যবহার থাকলেও তুলনায় তা অপ্রতুল। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে সাহিত্যেও তিনিএই রঙগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে এসেছেন বারবার, তবে স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে । রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙ কেবল দৃশ্যজাত আবেদন রচনাতেই সচেষ্ট। গাঢ় ও হাল্কা রঙের বৈপরীত্যে চিত্রপটে প্রকাশ পায় তাঁর ছবির ইমেজ। য়েমন নিসর্গের ছবিতে বা প্রতিকৃতিধর্মী চিত্র হলুদের বিপরীতে ঘন বাদামি বা কমলার সঙ্গে কালোর সিল্যুয়েট কোনো প্রতীকী অর্থ ঘোষনা করেন । তা কেবল দৃষ্টির বৈভবে সম্পূর্ণ। কিন্তু সাহিত্যের বেলায় প্রত্যেক অর্থ ঘোষণা করে না। তা কেবল দৃষ্টির বৈভবে সম্পূর্ণ । কিন্তু সাহিত্যের বেলায় প্রত্যেক রঙকে আর একটা স্বতন্ত্র অর্থে গেঁথে দেন তিনি। এই অর্থ যেন টেক্সট - এর নীচে লীন হয়ে মিশে থাকে সাবটেক্সট হিসেবে। সেখানে লাল কালো অথবা সাদা হলুদ সকলেই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দেখায়। আরো তলিয়ে বোঝা যাবে লাল ও কালো রঙ রবীন্দ্র সাহিত্যে সর্বদাই নেগেটিভ ভাবনার বাহক, তারা অশুভের ইশারা বয়ে আনে। রঙের সাংকেতিকতার পাশাপার্শি দিন -রাত্রির আলো - আঁধারিকও চরিত্রের মুডের সঙ্গে মিলিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। নায়ক - নায়িকার মনের দ্বন্দ্ব দুর্যোগের মুহূর্তে সময়ের সেই ক্ষণটিও হয়ে ওঠে অমোঘ নাটকীয় উপাদান। কাহিনীর সর্ব রঙের এই অর্থবহ প্রলেপ, সময় ও আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিত ফুটে ওঠে কোড - ল্যাঙ্গুয়েজের মতো। অনেক সময় মনে হয়, এ যেন অঙ্গিকের এক আপাত - সরল সমীকরণ । সচেতন পাঠক এ বিষয়ে কিছুটা অবহিত হওয়ার পর নিজেই আঁচ করতে পারেন দুর্যোগের আগাম ইশারা বা বিপদের মেঘ সরে যাবার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

দু একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিস্কার হতে পারে রঙের সাংকেতিক অর্থ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’উপন্যাসটি হাতে নেওয়া যাক। রচনাবলীতে গ্রন্থিক হবার সময় রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসের বিষয়ে বলেছেন ও লেখায় তাঁকে নামতে হয়েছে মনের সংসারের সেই কারখানা - ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ়ধাতুর মূর্তি

জেগে উঠতে থাকে। তিনি এখানে কেবল ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেননি বিশ্লেষন করে তাদের 'আঁতের কথা' বের করে দেখিয়েছেন। আমাদের মনে হয় এই আঁতের কথা বলতে গিয়ে দুটি প্রধান উপাদানের সাহায্য বারবার গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। একটি লাল রঙের সাংকেতিক প্রয়োগ আর একটি সন্ধ্যার আলো - আঁধারি রহস্যময়তা, এবং সেখানেও দেখা যাবে রাঙা আলোর তথা লাল রঙের অকৃপণ ব্যবহার ।এগুলোর পাশাপাশি আছে সাদা - কালোর নানান ঘনত্ব ও চাঁদের আলোর আবছায়া বা গুমোট দিনের স্বল্পালোক। সমগ্র উপন্যাসে মাত্র দু - একবার নীলের আভাস চোখে পড়ে। তার মধ্যে একবার কাহিনীর অন্যতম নায়ক বিহাবীর রোমান্টিক কল্পনার মূহূর্তে। প্রথম দিকের একটি ঘটনা দিয়ে উদাহরণ শু করি---

মহেন্দ্র ও বিহারী দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু বিবাহের পাত্রী হিসাবে আশোক দেখতে গিয়েছে। বিয়ের প্রস্তাব বিহারীর সঙ্গে । দুই বন্ধু যখন পৌঁছচেছ তখন চৈত্রমাসের দিবাসান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ' আলাপ চলাকালীন জ্যাঠামশাইয়ের অনুরোধে পিতৃহীন আশা পানের বাটা দিতে এলে 'বারান্দার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে সূর্যাস্তআভা তাহার লজ্জিত মুখকে মন্ডিত করিয়া গেল'। এবং 'কম্পান্বিতা বালিকার (আশা) কণ মুখছবি' মহেন্দ্র মনে মনে স্থির করে বসলে, যে বিহারী নয়--- সেই স্বয়ং আশাকে বিয়ে করবে। অবশেষে মহেন্দ্রর সঙ্গেই আশার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু অস্তমুখ সুর্যের রাঙা আভায় আশাকে মন্ডিত করে লেখক যেন শুতেই এক অশুভ সংকেতের সূচনা করে দিলেন।

এই সন্ধ্যার রাঙা আভা ও লাল গোলাপির উপস্থিতি কেমন করে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে ছড়িয়ে কীভাবে অদৃশ্য রিমোট -এর মত সমগ্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বিস্মিত হয়ে দেখতে হয়। হিসেব করলে দেখা যাবে 'চোখের বালি'র পঞ্চান্নটি অধ্যায়ে প্রায় চল্লিশটি সন্ধ্যার প্রসঙ্গ আছে এবং তার মধ্যে কয়েকটি এপিসোড কাহিনীর জন্য কীপরিমাণ জরি তা সচেতন পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন।

আর এক সন্ধ্যায় কথা বলা যাক। এ দিন সন্ধ্যার সময় দুইজনে (মহেন্দ্র ও আশা) ঢাকা বারান্দায় বিছানা করিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে খোলা ছাদ। বৃষ্টির পরে কলিকাতায় দিগন্তব্যাপী সৌধশিখরশ্রেণী জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। বাগান হইতে রাশিকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা 'গাঁথিতেছে' ----সন্ধ্যাবেলায় এমন রোমান্টিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ পাঠককে একটু ধাক্কা দিতে চান, তাই তখনই আবিষ্কার হয় এই প্রেমবিহ্বল নবদম্পতির পোষা কোকিলটি মরে গেছে, সে আর ডাকছে না, এরপর অনাগত অমঙ্গলের আশাঙ্কায় আশা ম্লান হয়ে যায়, মহেন্দ্রর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সে আঁচল থেকে সমস্ত বকুল ফেলে দেয়। আর সন্ধ্যার এই মুহূর্তেই বিহারী এসে উপস্থিত--- তাতে দুজনে যেন হঁাফ ছেড়ে বাঁচলি তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে।

উপন্যাস আরো জটিলতার দিকে বাঁক নেয় আশা - মহেন্দ্রর সংসারে বিনোদিনীর আগমনে। বুদ্ধিমতি যুবতী বিধবাবিনোদিনী অচিরেই আশার প্রিয় সখীতে পরিণত, কাহিনীর শিরোনাম 'চোখের বালি' পাতানোও তাদের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মহেন্দ্রর সঙ্গে সখীর দেখা হয়নি তখনও। তবে বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রর আলাপ করিয়া দিতে আশা ব্যাকুল। এই সাক্ষাতের প্রসঙ্গেও সন্ধ্যার অবতারণা ----'সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যন্ত আবদার করিয়া ধরিল আমার চোখের বালির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে।' আলাপ শীঘ্রই ঘটেছে এবং সরলমতি আশা এইভাবেই খাল কেটে কুমির এনেছে তার জীবনে। এরপর আশা তার 'অবাধ্য সখী'কে 'উপযুক্তরূপে জব্দ' করবার জন্য মহেন্দ্রকে দিয়ে বিনোদিনীর অজান্তে তার ফোটো তোলার প্ল্যান তৈরি করেছে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে এইএপিসোডের গুত্ব অনেকখানি। ফোটো তোলার অছিলায় ঘুমন্ত বিনোদিনীকে মহেন্দ্রর নিরীক্ষণ, তার চুল সরিয়ে দেওয়া, শাড়ি ঠিক করে দেওয়া---- এসব এ পর্বেই ঘটবে এবং ঘটবে ভালোমানুষ আশার উপস্থিতিতেই।

মহেন্দ্রের জীবনে বিনোদিনীর গাঢ় ছাপ পড়ার শু হবে এখানে থেকে রবীন্দ্রনাথও এই ঘটনাকে বেশ তাৎপর্যময় ভঙ্গিতে

বর্ণনা করেছেন। তবে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনাটা সন্ধ্যাবেলায় ঘটছে না, ঘটা সম্ভবও নয়। কারণ সেই আমলে ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ ইত্যাদির সুবিধা ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথকে বুঝি আয়োজন করতে হয়েছে দুপুরবেলায় প্রখর আলোয়। তাহলে সেই সাংকেতিক রঙের পোঁচ কীভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিলেন তিনি। আশার জীবনে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসবার এই অশুভ মুহূর্তে, পশ্চিমাকাশে রাঙা আলোর ঘনঘটার বদলে রবীন্দ্রনাথকে দেকা গেল, বিনোদিনীর গায়ে একটিা লাল রঙ শাল ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর অন্য কিছু ভাবতে পারলেনে না। হয়তো এ কারনেই বিনোদিনীকে লাল শাল জড়িয়ে আসতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ফোটোগ্রাফের সৌন্দর্য ও কম্পোজিশানের খাতির মহেন্দ্রকে বিনোদিনীর পায়ের কাছে শালটা একটু বাঁদিকে সরিয়ে দিতেও হয়েছে পাছে আশা ঠিকঠাক না পারে ---- এই আশঙ্কায়।

কৌতুহলোদ্দীপক এই এপিসোডটি ঘিরে আমাদের মনে কিছু প্র জাগে। এই ফোটো তোলার ঘটনার কিছু আগেই লেখক শুনিয়েছেন তখন শরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এত কি পড়ে গেল যে বিনোদিনীকে লাল শাল জড়িয়ে আসতে হল ?হঠাৎ কি বৃষ্টি - বাদলার নিম্নচাপ দেখা দিয়েছিল ?আর একটা ব্যাপারও মাঝে মাঝে উঁকি দেয় ---লাল রঙ, প্রেমের, বিবাহের সঙ্গে যুক্ত, তা বৈধব্যের বিপরীতে অবস্থান করে। সে যুগের বিধবারা কি আদৌ লাল শাল গায়ে দিতেন! এ-বিষয়ে মন্তব্য করা মুশকিল । আশাদের সংসারে এসে পড়বার আগে বিনোদিনী গ্রামে বাস করত। গ্রামের আচার - নিষ্ঠা মেনে চলা বিধবার গায়ে লাল শাল দৃশ্যত একটু বেমানান নয় কি ?যদিও বিয়ের আগে সে মেমসাহেবের কাছে পড়াশুনো করেছে এবং বিহারীর ভাবনায় সে একজন বিলাসিনী যুবতী বলে অভিহিত । কিন্তু তার পোশাকের অন্য ডিটেল বিষয়ে লেখক কিছু বলেন না। তাই বিনোদিনীর গায়ের লাল শালের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলা সহজ নয়।

শুধু একটুকু বলা যায়, মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর নিষিদ্ধ সম্পর্কে গড়ে ওঠার মূহূর্তে অশুভ চিহ্ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সংকেত লালের উপস্থিতি সেখানে অত্যন্ত জরি হয়ে উঠেছিল। তাই শালের রঙ লাল ছড়া আর অন্যকিছু হতে পারতো না।

আবার দৃশ্যটি সন্ধ্যার নয়, তাই পশ্চিমাকাশের রাঙা আভায় বিনোদিনীকে মাখিয়ে দেওয়া যায়নি। মহেন্দ্রর পক্ষে লাল পাঞ্জাবি বা শার্ট কি ফতুয়া সে যুগে তত সম্ভব ছিল না । তাছাড়া মহেন্দ্রর লাল জামা ততটা তাৎপর্য বহন করবে না, কারণ লেখক বিনোদিনীকে দিয়েই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করতে চান। আশা তো মহেন্দ্রর বিবাহিতা স্ত্রী, তার পক্ষে লাল শাড়ি স্বাভাবিক, কিন্তু এখানে আঙ্গুলিনির্দেশ তার দিকে নয়, বিনোদিনীই এই দৃশ্যের তথা উপন্যাসের নায়িকা। তাই অবশেষে ভাদ্র - আশ্বিনের ভ্যাপসা গরম দুপুরে বিনোদিনীর জন্য লাল শালের অমোঘ নির্বাচন---যা রবীন্দ্রনাথের লেখার অতি সাধারণ এক ফর্মুলার রূপ পেয়েছে। 'চোখের বালি'র প্রায় পঁচিশ বছর লেখা 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও আমরা দেখব মধুসূদনের শোবার ঘরে তার বিধবা বৌদি শ্যামাসুন্দরী লাল শাল গায়ে দিয়ে ঢোকে এবং সেই একই নিষিদ্ধ সম্পর্কে তারাও অভিযুক্ত।

'চোখের বালি'র আরও অনেক দৃশ্যে লালের অশুভ ইশারা আছে--- যেমন আশার হাতের লেখায় বিনোদিনীর প্রেমের চিঠি, মহেন্দ্র সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসবে এবং সেই 'প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ নিকটাগত, বিষাক্ত অথচমধুর, একইকালে উপহৃত অথচ প্রত্যাখ্যাত প্রেমের আভাস' তাকে মাতাল করে তুলবে এর মধ্যে সেলাই করতেকরতে বিনোদিনী মহেন্দ্রর কথার উত্তর দিতে গিয়ে আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্তপাত ঘটাবে-- সে পর্বেও 'মাঘের অপরাহ্নতখন সন্ধ্যায় অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার উপক্রম করেছে' ইত্যাদি। এখানে একই সঙ্গে একাধিক লালের প্রয়োগ-বিনোদিনীর হাতে ছুঁচ ফুটে রক্ত, সন্ধ্যাবেলার রাঙা আভা আবার মহেন্দ্রও তখন 'দ্ধ সজলস্বরে' বিনোদিনীর হাতচেপে ধরবে, তার মনেও প্রেম - কামনার রঙ এবং সে রঙও নিশ্চয়ই লাল হয়েই ফুটেছে।

তবে লাল ও গোলাপির সবচেয়ে সেনসিটিভ প্রয়োগ আশার অনুপস্থিতিতে বিনোদিনীর দ্বারা মহেন্দ্রর শোবার ঘর সাজানোর দৃশ্যে। সে যেন সুদক্ষ ইনটেরিয়র ডিজাইনারের তৈরি আধুনিক গৃহশজ্জা । যেমন সুদৃশ্য তেমনিপ্র্যাক্টিকাল।
'মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার শয়নঘর দেখিয়া আশর্চ্য হইয়া গেল। দ্বারা খুলিয়াই দেখিল, চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া আছে। মশারিতে গোলাপি রেশমের ঝালর লাগানো। নীচের বিছানায় শুভ্র জাজিম তকতক করিতেছে এবং তাহার উপরে পূর্বেকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে রেশম ও পশমের ফুলকাট বিলাতি চৌকা বালিশ সুসজ্জিত। ...দেয়ালে মহেন্দ্রর যে বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চারকোণে রঙিণ ফিতার দ্বার সুনিপুণভাবে চরিটি গ্রন্থি বাঁধা এবং সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুইধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, ...সবসুদ্ধ সমস্ত ঘরের চেহারা অন্যরকম। খাট যেখানে ছিল সেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে,খাটের সম্মুখে দুটি বড়ো আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া আড়ালের মতো প্রস্তুত হওয়ায় নীচে বসিবার বিছানা ও রাত্রে শুইবার খাট স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। য়ে আলমারিতে আশার সমস্ত শখের জিনিস চীনের খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারির কাঁচের দরজার ভিতরের গায়ে লাল সালু কুষিত করিয়া মারিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন আর তাহার ভিতরের কোনো জিনিস দেখা যায় না । ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব - ইতিহাসের যে কিছু চিহ্ন ছিল, তাহা নূতন হস্তের নব সজ্জায় সম্পূর্ণ আচছন্ন হইয়া গেছে।

এই দীর্ঘ কোটেশনের শেষ বাক্যটিই বোধ করি মূল কথা। আর এখানেই একই চিহ্নের পুনরাবৃত্তি--- মহেন্দ্রর শয়নকক্ষে বিনোদিনী নিজের স্বতন্ত্রত ঘোষণা করতে লাল- গোলাপির সাহায্যই গ্রহণ করেছে। আশার শখের জিনিসেরসঙ্গে আশাকেও মহেন্দ্রর দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে দিতে বিনোদিনী ব্যবহার করেছে লাল সালু-- যা সেই লাল শালেরই রূপান্তর যেন।

কাহিনীর জটিলতা, ঘটনার মোচড়, মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই রঙের সিগনাল দিয়ে পাঠককে নাড়িয়ে দেন। সন্ধ্যার আলো আঁধারি মায়ামমতা, রাত্রে স্বল্পলোকিত চাঁদের আবছায়া বা মেঘলাদিনের বৃষ্টির প্রেক্ষাপটও তেমনই নানা সংকেতবাহী হয়ে ওঠে। যেমন 'চোখের বালি' উপন্যাসেরই আর একটি অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ পর্বের আসা যাক।

সেদিন ধোপাকে কাপড় কাচতে দেবার সময় আশা আবিষ্কার করবে মহেন্দ্রর জামার পকেটে বিনোদিনীর চিঠি। ঘটনাটি ক্লাইম্যাক্স -এ পৌঁছানোর আগেই যেন সতর্ক হয়ে ওঠে পাঠকের মন, কারণ 'সেদিন প্রত্যুষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে', পাঠক অচিরেই অনুভব করবে কালো মেঘ কীভাবে আশার মনের আকাশকেও দ্রুত ছেয়ে ফেলতে চলেছে। শুধু তাই নয়, মহেন্দ্র বিনোদিনী রাজলক্ষ্মী ও আশা --- সকলের মধ্যে তীব্র নাটকীয় সংঘাতের প্রেক্ষাপটে 'আবার এক পশলা ঘন বৃষ্টি আসিল' ইত্যাদি বাক্য অর্থবহ আবহসঙ্গীতের ভূমিকা পালন করে চলে, ত্রমে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই মেঘ এই বৃষ্টিও অবশ্যম্ভাবী চরিত্র হয়ে ওঠে অন্যদের সঙ্গে।

'ঘরে - বাইরে' উপন্যাসে প্রথমেই ''বিমলার আত্মাকথা'' শু হয়েছে 'সিঁথের সিঁদুর' লাল পেড়ে শাড়ি ইত্যাদি শব্দে গাঢ় লাল রঙের নিগূঢ় ব্যঞ্জনায়। এই লাল অবশ্য এখানে সতীত্ব, পুণ্য, পবিত্রতা ইত্যাদির প্রতীক । যে জিনিসগুলি থেকে বিমলার স্খলন ঘটবে এই উপন্যাসে। যেন সেই কথা ইশারায় বলে দেওয়া হল শুতেই। ত্রমশ দেখাযাবে কীভাবে লাল রঙ তার অর্থময় চিহ্ এঁকে গেছে উপন্যাসের সারা শরীরে।
স্বদেশীযুগের পান্ডা সন্দীপ, নিখিলেশদের নাটমন্দিরে সভা করতে এলে বিমলা তার মধ্যে 'সে এক আশর্চ্যমূর্তি দেখতে পায় । 'বিশেষত এক সময় সূর্য ত্রমে ত্রমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর যখন হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে' তখন 'বিমলার হুঁশ ছিল না।' এ সেই একই সংকেত সূর্যাস্তের রাঙা আভায় পরস্পরের দেখা, যার ভবিষ্যৎ পরিণামে জটিলতার স্পর্শ। আবার বিমলা, সন্দীপকে যেদিন দুপুরে খেতে নিমন্ত্রণ করল, সেদিন বিমলার সাজটাও মনে রাখতে মতো। বিমলার কথায়--- 'সকালে মাথা ঘষে আমার দুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিল

াম' ---যদিও সেদিন বিমলার পরনে ছিলো সাদা জরি - পাড় মাদ্রাজী শাড়ি। কিন্তু সুদীর্ঘ এলোচুলে নিপুণ করে বাঁধা লাল রেশমের ফিতেয় অনেক কথা বলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আর মেয়েদের চুল নিয়ে তাঁর লেখায় এক অদ্ভুত অবসেশন চোখে পড়ে---- যা নারী চরিত্রের প্রতি তীব্র যৌন আকর্ষণের প্রতীকে পরিনত হয়। বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালি বিস্তৃত হয়ে মহেন্দ্রের জীবনে 'পূর্বেকার সমস্তসাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করে দিয়েছে' ----এ আমরা দেখেছি। 'চতুরঙ্গ' -র দামিনীকেও দেখা যাবে 'সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সন্মুখে দিবসের শেষ প্রণামের মত নত' হয়ে পড়লে গুজির গানের শেষে দামিনী মাথা নত করে প্রণাম করবে এবং তার 'চুল এলাইয়া' মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। রাত্রিতে গুহার অন্ধকারেও শচীশ ঘোরের মধ্যে যে মস্তএকটা ক্ষুধা অনুভব করেছিল, সে ঘোর কাটলে তার মনে হবে 'পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে' --- সেও তো দামিনীর আলুলায়িত চুল ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ঘরে- বাইরে' তে আবার কালোচুলের মধ্যে থেকে রাঙা মশালের মতো লাল ফিতে, শরীরী আকর্ষণকে আরো তীব্র করেছে। রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখে বলিয়েও নিয়েছেন এ -কথা --- 'ঐ যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট একটুকু, রাশি রাশি ঘষা - চুলের ভিতরর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ওযে কালবৈশাখীর লোপুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা'। লালের আড়ালে গোপন কামনার ছায়া এই উপন্যাসে আরো অনেকবার চোখে পড়বে আমাদের। সন্ধ্যার অশুভছায়াও 'ঘরে - বাইরে' উপন্যাসে পড়েছে একাধিকবার। একেবারে অন্তিম পর্বে--- যখন সন্দীপ দাঙ্গার ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, নিরস্ত্র নিখিলেশ ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেছে দাঙ্গা ঠেকাতে, মুসলমানদের বোঝাবার শেষ চেষ্টা করতে--- সেই মূহূর্তেও বিমলার আত্মকথায় লেখা হয়েছে।

'দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানালার সামনে পশ্চিম দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত সজনে গাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুইভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা প্রচন্ড পাখির ডানা মেলার মতো--- তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে ---থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যে হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রেরসমূদ্র পার হবার জন্যে।'

সুর্যের অস্ত যাওয়া, মেঘের আগুন ঘটা, আগুন রঙ, একটা ডানা মেলা প্রকান্ডপাখির উপমা ইত্যাদি নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে মিশে যাওয়ার সর্বত্র এখানে অমঙ্গলের চিহ্ ছড়ানো । এবং আমরা দেখতে পাব অনেক রাত্রে রাজবাড়িতে ফিরে আসবে আহত নিখিলেশের দেহ, তার 'মাথায় বিষম চোট লেগেছে।' 'কি হয় কিছু বলা যায় না। ' অমূল্যের মৃত্যু ঘটেছে ঘটনাস্থলেই।

'ঘরে বাইরে'র প্রায় বালো - তেরো বছর পরে লেখা হয়েছে 'শেষের কবিতা' ; সম্পূর্ণ অন্য স্বাদ এই উপন্যাসের। এ পর্বে তিনি ছবির জগতের দরজায় প্রায় পৌঁছে গেছেন। লেখার মধ্যে তাঁর প্যালেটে আসছে কিছু অন্য রঙ--- আগে যাদের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। তারা মিনে -করা অলঙ্কারের মতো হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে চলে যায়। কিন্তু বর্ণের রূপক - কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সেই আগের জায়গাতেই । যেনম 'শেষের কবিতা'র অমিত - লাবণ্যের প্রথম সাক্ষাৎ পর্ব তা প্রায় সিনেমাটিক কায়দায় ঘটলেও এই দেখা যে সাধারণ দেখা নয়, তা জানিয়ে দেন চেনা ইশারায় --- 'আকস্মিকের বিদুৎ - আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচন্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য - নক্ষত্রের আগুন জ্বলা ছাপ'। বিহারী ও মহেন্দ্র আশাকে দিবাবসানের রাঙা আলোয় প্রথম দেখেছিল। বিমলা যখন সন্দীপকে প্রথম দেখেছে, তখনও বিকেল শেষের রৌদ্র (প্রায় সন্ধ্যার মূহূর্তে) এসে পড়েছে সন্দীপের মুখে। এগুলো সবই অমঙ্গলের চিহ্ বয়ে এনেছে, এ আমরা দেখেছি। কিন্তু অমিত লাব্যণের প্রথম দেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রঙ নীলের অ্যাসোসিয়েশন এসে পড়ল, রঙের কোড - ল্যাঙ্গুয়েজে লেখকমুহূর্তে জানিয়ে দিলেন এদের এই দেখা, অন্য মাত্রার প্রেমে পরিণতি পাবে। নীলকে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই অশুভের দূতী করে তুলবেন না।

‘শেষের কবিতা’র কয়েক বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছে ‘দুই বোন’ । এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ রীতিমতো তাক্ লাগানো চিত্রকর। দেশে বিদেশে অসংখ্য চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি আর সাহিত্যেকে তিনি দুটি ভিন্ন কোঠায় জায়গা দিয়েছেন। ছবিতে ভিসুয়ালটাই তাঁর কাছে প্রধান, এমনকি ছবির নামকরণ করতেও রাজি নন তিনি, কারণ ছবির ভাষা স্ব তন্ত্র, তার গায়ে সাহিত্যের মার্কা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন তিনি মনে করেন না---ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সাহিত্যের অ াসরে রঙের প্রতীক বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ সেই পুরনো ফর্মূলাকেই প্রয়োগ করেছেন। অসুস্থ দিদি - জামাইবাবুর সংসারে এসে ঊর্মিমালা ত্রিকোণ প্রেমের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে ‘দুইবোন’ উপন্যাসে। এখানেও লাল এসেছে নিষিদ্ধ প্রেমের ব ার্তা নিয়ে। হোলির দিনে ঊর্মি ও শশাঙ্কের আবীর নিয়ে মাতামাতি, ঊর্মির শাড়িতে দোয়াতের লাল কালি ঢেলে দেওয় া--- এসবই শর্মিলার সংসারে অমঙ্গলের চিহ্। তার পরে ঊর্মির মন - খারাপ - করা রাত্রে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার প্রতিমাও একই অর্থে ব্যবহৃত । এরা সকলেই নিষিদ্ধ, কলঙ্কিত ‘কামনায় গোপন উদ্দীপনায় রাঙা,’ যৌনতার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ, যা রবীন্দ্র - উপন্যাসের অতি পরিচিত অমোঘ বর্ণ - সংকেত। যে - সংকেত লেখকের কলমে বারংবার পুনারাবৃত্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রঙের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের দেশের ঝলমলে মিনিয়েচার ছবির কথা স্মরণ করায়। রঙ তাঁর লেখায় কোনো প্রতীকের ছায়া ফেলে না, সে আপন মহিমায় ভাস্বর। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যের রাফায়েল বলতে প ারি সহজেই। প্রকৃত কালারিস্ট এর মতো রঙকে রূপকের সঙ্গে গিঁট বেঁধে দিতে চান। বর্ণের নিজস্ব উপস্থিতির চেয়েও সে আরো অন্য কিছু বহন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তাঁর প্যালেটও সীমাবদ্ধ, আলো - অন্ধকারের খেলাই যেন প্রধান। রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের রেমব্রান্ট বলেতে বোধ করি আমাদের বাধা থাকে না। আর রবীন্দ্রনাথের রঙ বিষয়ক এই নিজস্ব ভাবনা নিঃসন্দেহে তাঁর জীবন থেকে উঠে এসেছে যা তাঁর বর্ণ - দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে সংসক্ত---- এ- কথা আমরা জানি।

উ ল্লেখপঞ্জি
রবীন্দ্র - রচনাবলী ঃ ১২৫তম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, ঋিভারতী, ১৩৯৪ রঙের রবীন্দ্রনাথ ঃ কেতকী কুশারী ডাইসন, সুশোভন অধিকারী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা ১৯৯৭।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com